127

তারিখ 04 JAN 1994

আজকের কাগজ

# শিক্ষকের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদের শিক্ষক ঃ প্রসঙ্গ অধ্যাদেশ '৭৩

আবদুল বায়েস

১. ভূমিকা

তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা ছিল স্বৈরতান্ত্রিক, যেখানে বিভিন্ন কালাকানুন দিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্ত বুদ্ধি তথা মুক্ত চিন্তার পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল। প্রকৃত জ্ঞানার্জন এবং গবেষণা যেহেতু নিয়ন্ত্রণ আর ফরমায়েশের মাধ্যমে সম্ভব নয়, সেহেতু ঐ আমলে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিবাদ উঠতে থাকে এবং দীর্ঘকাল ধরেই একটা স্বায়ত্তশাসিত ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভাবনা এদেশের সচেতন নাগরিক, শিক্ষক ও রাজনীতিবিদদের তাড়িত করে আসছিলো। তার ফলে যে কাঠামোটি সর্বজন স্বীকৃত হিসাবে আবির্ভূত হলো তা-ই হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার কর্তৃক প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ '৭৩। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া খেলনা নয় অধ্যাদেশ '৭৩, বরং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠগুলোতে মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চেতনা, গণতান্ত্রিক আচরণের লালনক্ষেত্র হিসেবে গড়ার শাশ্বত চিন্তার ফল। স্বর্তব্য, অধ্যাদেশ '৭৩ একটা ব্যবস্থাপনা 'মডেল' যার কার্যকারিতাও সীমাবদ্ধতা যে কোন গাণিতিক মডেলের মতোই কতগুলো অনুমিত শর্তের, প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন ও সঠিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোর শর্তগুলোর অন্যতম হচ্ছে (ক) প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসন প্রদান (খ) রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে রাজনৈতিক দলগুলা, বিশেষতঃ সরকার কর্তৃক শিক্ষক-ছাত্রদের ব্যবহার না করা এবং (গ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকাণ্ডে যোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব।

বর্তমান সরকার অধ্যাদেশ '৭৩ পরিবর্তনে বদ্ধ পরিকর বলে মনে হয় এবং ইতিমধ্যেই এতদসংক্রান্ত বেশ কিছু অগ্রগতির আভাস আমরা পেয়েছি। একটা নির্বাচিত সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা অধ্যাদেশ '৭৩ নিয়ে ভাববেন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনে শিক্ষা ও গবেষণার স্বার্থে, অধ্যাদেশ নাড়াচাড়া করবেন তাতেও ক্রটির কিছু নেই। কিন্তু কেন, কীভাবে এবং কী ধরনের এ পরিবর্তন সে সম্পর্কে খুব স্বচ্ছ ধারণা আমাদের সবার থাকা উচিত। তা না হলে কেনেথ গলব্রেথের ভাষায়, "রোগ নির্ণয় না করে শুধু ওষধ আবিষ্কার" বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার তথা জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে বলে অনেকেই মনে করেন না।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের রোগ, ডাক্তার ও ওষুধ ঃ

অধ্যাদেশ '৭৩-এর বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণত এই অভিযোগ আনেন যে, অধ্যাদেশ '৭৩ প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে, কারণ (ক) শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ও রাজনীতি করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে; (খ) শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রদেরকে ক্ষমতায় (অর্থাৎ উপাচার্য হওয়ার) হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে জ্ঞান চর্চার পথ রুদ্ধ করা হচ্ছে (গ)-এর সুযোগে নিয়ে অনেক ছাত্র সন্ত্রাস করছে, যাতে কিছু শিক্ষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মদদ যোগাচ্ছেন এবং (ঘ) স্বায়ত্তশাসনের পথ ধরে শিক্ষকরা প্রমোশন আর্থিক শৃংখলা ইত্যাদি নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করছেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। এ রোগগুলো নিরাময়ে প্রস্তাবিত ওষুধ হচ্ছেঃ প্যানেল বাদ দিয়ে 'চ্যানেল' প্রথা চালু (অর্থাৎ নির্বাচনের পরিবর্তে সরকার কর্তৃক সরাসরি পছন্দ মতো উপাচার্য নিয়োগ) উপাচার্যের ক্ষমতা পাকিস্তানী আমলের মত বৃদ্ধি করে Hire and Fire পদ্ধতির প্রবর্তন, বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে আনা ইত্যাদি। আর রোগ নির্ণয়কারী এবং ওষুধ প্রদানকারী 'ডাক্তার' হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য পরিষদ যার অধিকাংশ সদস্য অ-নির্বাচিত ভিসি এবং অনেকেই মনে করে থাকেন উপাচার্য হওয়ার পূর্বে তাদেরকে কোন একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠনের সদস্য বা উপদেষ্টা হিসেবে আন্তরিকতার প্রমাণ দিতে হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তাদের একমাত্র দক্ষতা এবং যোগ্যতা হয়ে দাঁড়ায় ওই রাজনৈতিক দলটির কর্মকাণ্ডের গুণ কীর্তন করা।

৩. নকল রোগ, নকল ডাক্তার এবং নকল ওষুধ ঃ

বিভিন্ন ইস্যুতে জনগণের মধ্যে দলাদলির প্রবণতা নতুন কোন ঘটনা নয় এবং তা বাংলাদেশের বাইরেও বিস্তৃত। শিক্ষকদের মধ্যে যেমন দলাদলি আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের আমলাদের এমনকি একই রাজনৈতিক দলের ভেতরও। আর তথাকথিত এ রোগটি পুরোমাত্রায় অবস্থান করছে এমনকি যেসব বিশ্ববিদ্যালয় '৭৩ এ অধ্যাদেশ নেই এবং যেখানে অধ্যাদেশ পরিবর্তনের ডাক্তাররা উপাচার্য হিসেবে বহাল তবিয়তে আছেন, সেখানেও। কাজেই শিক্ষকদের দলদলি অধ্যাদেশ পরিবর্তনের কারণ হিসেবে যথাযথ মর্যাদা লাভ করতে পারে বলে মনে হয় না।

এবার শিক্ষকদের রাজনীতি সংক্রান্ত তিনটি দিকের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর সবদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষকদেরই

সেইহেতু 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' বা 'জিয়া পরিষদের সদস্য। এবং (৩) একটা অংশ পরোক্ষভাবে কোন না কোন দলের প্রতি আনুগত যা সাধারণতঃ প্রকাশিত নয়। শুধুমাত্র শিক্ষক কেন, সমাজের সবারই রাজনীতি করা উচিত বলে অনেকে মনে করে থাকেন। ফ্রান্স বা আমেরিকায় কৃষক বিরোধী কোন অর্থনৈতিক ভূমিকা নেয়া যে সরকারের পক্ষে কঠিন তার একমাত্র কারণ ওই সব দেশের কৃষকরা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন অথবা রাজনীতিতে জড়িত বলেই। আবার বাংলাদেশ যে স্বাধীনতার ২২ বছর পরও মাথাপিছু আয় ২১০ ডলার, ভূমিহীনের সংখ্যা ৬০% এবং ব্যাংকের টাকা

কার্যদিবস শিক্ষা ও শিক্ষকের অধ্যাদেশ বহির্ভূত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই বেশিটা হতে পারে। শিক্ষকদের রাজনীতিজনিত কারণে অধ্যাদেশ পরিবর্তনে হাত দেয়ার আগে এ সম্পর্কে গবেষণামনস্ক তথ্য হাজির করা প্রয়োজন।

উপাচার্য প্যানেল তৈরির পর ছাত্রদেরকে উপাচার্য হওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করাকে একটা রোগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং তার ওষুধ হিসেবে চ্যান্সেলরকর্তৃক সরাসরি উপাচার্য নিয়োগকে (চ্যানেল প্রথা) ডাক্তার সাহেবরা একমাত্র ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করার

শিক্ষকদের নানাপ্রকার আলোচনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ নামক ওষুধ চাপিয়ে "মুখরা রমণী বশীকরণ" নীতি গ্রহণ করলে রমনীকে আরো মুখরা করে তুলতে পারে। ঐ ক্ষেত্রে ডাক্তাররা হয়ত বা পা বাঁচাতে অন্য কোন 'পরিষদে' তাৎক্ষণিকভাবে যোগ দেবেন



ফেরৎ না দিয়ে নিজেদের আয়েশ বৃদ্ধি করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাও ঐ রাজনৈতিক অসচেতনতা ও রাজনীতি না করার ফল। অন্যদিকে বলতে গেলে, ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সর্বশেষে স্বৈরশাসনের বিদায় ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তোরণ যার ফসল বর্তমান সরকার প্রক্রিয়ায় ছাত্র-শিক্ষকের রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা আড়াই বছরের মাথায় কেউ চট করে ভুলতে চাইলেও জাতি কোনদিনও ভুলতে পারে না। এখানে স্ববিরোধী অবস্থানের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। অনেক নীতি নির্ধারকই শিক্ষক রাজনীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভায় বক্তব্য পেশ করে থাকেন এবং সবদোষ নন্দঘোষের উপর চাপিয়ে থাকেন। অথচ বর্তমান সরকারের মন্ত্রী সভায় দু'জন মাননীয় সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অতীতে যারা রাজনীতিতে জড়িত এবং সক্রিয় ছিলেন। বিভিন্ন সংস্থায় নিযুক্তি পেয়েছেন এমন শিক্ষক এবং অধ্যাদেশ পরিবর্তনের 'ডাক্তার' বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের উপাচার্যগণ 'জিয়া পরিষদের' সদস্য বা উপাচার্য হিসেবে আগেও ছিলেন এখনও বহাল আছেন। জিয়া পরিষদ কি রাজনৈতিক সংগঠন নয়? অথচ শিক্ষক রাজনীতি যদি খারাপ হয়ে থাকে তবে তাদেরও ওসব অবস্থানে থাকার কথা নয়। ব্যাপারটা কি এ দাঁড়ায় না যে পাপকে ঘৃণা করি কিন্তু পাপীকে নয়, যদি সে আমার দলের হয়? আমরা মনে করি কোন শিক্ষক যদি শিক্ষকের রাজনীতি করাকে অপছন্দ বা তার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে কোন রাজনৈতিক দল বা অঙ্গদলের সাথে নিজেকে জড়িত রাখা কোনো ক্রমেই নৈতিকভাবে সমর্থন যোগ্য নয়। এটা এক ধরনের কপঠতা বৈ কিছুই নয়। অধ্যাদেশ বহির্ভূত বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত উপাচার্য এবং জিয়া পরিষদের উপদেষ্টারা যখন অধ্যাদেশ ও শিক্ষক রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন তখন কি বলতে ইচ্ছে করে না " তুমি কোন কাননের ফুল গো, কোন গগণের তারা?"

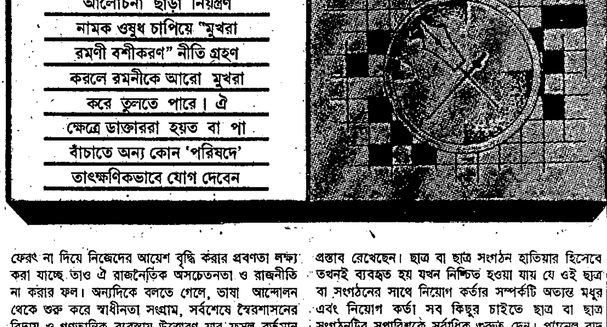

এক্ষেত্রে আসলে মূল বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিৎ শিক্ষক রাজনীতি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা কিংবা গবেষণা কর্মে ব্যঘাত সৃষ্টি করে কি না। আমি তো মনে করি না। যে শিক্ষক পড়াশুনা ও গবেষণা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক দলের

প্রস্তাব রেখেছেন। ছাত্র বা ছাত্র সংগঠন হাতিয়ার হিসেবে তখনই ব্যবহৃত হয় যখন নিশ্চিত হওয়া যায় যে ওই ছাত্র বা সংগঠনের সাথে নিয়োগ কর্তার সম্পর্কটি অত্যন্ত মধুর এবং নিয়োগ কর্তা সব কিছুর চাইতে ছাত্র বা ছাত্র সংগঠনটির সুপারিশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। প্যানেল বাদ দিয়ে চ্যানেল প্রথা চালু হলে ওই সম্পর্কটা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে বলে অনেকে মনে করেন এবং এমন কি আর্থিক লেনদেনে গড়ালেও অবাক হওয়ার মত কিছু থাকবে না, কারণ তখন সব 'এনার্জি' জড়ো হবে ওই একটি জায়গায়। এ ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারেন সাধারণত (ক) যার উপাচার্য হওয়ার সাধ ও সাধ্য (টাকা-পয়সা) দু'টোই আছে; (খ) যার সাধ ও ক্ষমতাসীনের সাথে মধুর সম্পর্ক আছে (যোগ্যতা নাইবা থাকলো) এবং (গ) যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিদের কর্তৃক গ্রহণযোগ্য। এ ধরনের পরিবর্তনের পূর্বে বোধকরি স্বাধীনতাত্তোরকালের অধ্যাদেশভুক্ত নির্বাচিত ও অধ্যাদশে বহির্ভূত সরাসরি মনোনীত উপাচার্যদের জীবন বৃত্তান্ত ঘেটে দেখা দরকার এ দু'য়ের মধ্যে গুণগত ফারাক এবং সেইভাবে বের করা দরকার কোন পদ্ধতিতে উপাচার্য যাদের শিক্ষা ও গবেষণা রেকর্ড অপেক্ষাকৃত ভাল।

বাংলাদেশের জনগণের কাছে এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা ও আতংকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাগত সন্ত্রাস যার হাতে জিম্মি হয়ে থাকে তাদের ছেলেমেয়েরা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং যার ফলে বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মাসের পর মাস। অধ্যাদেশের বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন কায়দায় এমনকি বোঝাতে চান যে ওই অধ্যাদেশের ফলেই এসব ঘটছে এবং এ রোগের ওষুধ হিসেবে আসছে অধ্যাদেশ পরিবর্তন। এ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা ও কথাবার্তা শোনা যায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ফলাফল এই যে, ছাত্রদের সন্ত্রাসের উৎস অস্ত্র এবং এই অস্ত্র বহন করার নিমিত্ত "লাইসেন্সবিহীন লাইসেন্স" বা ওপরওয়ালার পরোক্ষ সম্মতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সম্পর্কিত সরকারী কোন প্রেসনোটে আজ পর্যন্ত দেখানো যায়নি।

কারণ তাদের কাছে। আমাদের বিনীত প্রশ্নঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস হয়, কেন, যেখানে '৭৩'র অধ্যাদেশ নেই? কেন হাজারীবাগ বা ঝিনাইদহে সন্ত্রাস হয় যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নেই? মনোনীত ভিসির বিশ্ববিদ্যালয় কেন মাসের পর মাস বন্ধ থাকে সন্ত্রাসের কারণে? আসলে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন তথা শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, '৭৩'র অধ্যাদেশ পরিবর্তন করার ইচ্ছা নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম একটা রোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে শিক্ষকদের যেন তেন প্রকারে প্রমোশন ও আর্থিক বিশৃংখলা। এ অভিযোগটি খণ্ডন করা হয়ত বা কঠিন কিন্তু ব্যাখ্যাটি ভিন্নতর হতে পারে। এটা বোধ হয় ঠিক যে খুব অল্প সংখ্যক (অনুমান করি ৩%), শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রমোশন জিনিসটা এমন দাঁড়িয়েছে যে কোন "লেখালেখি" না থেকে নেতা বা উপাচার্যের সাথে "দেখাদেখি ও মাথামাথি" থাকলেই চলে, অথবা লেখালেখি সব প্রেস আছে" বললেও চলে। এতে করে অর্থনীতিতে যেমন Bad money drives and good money out of market ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বলা চলে a few bad teachers drive many good teachers out of scene অন্যদিকে, অভিযোগ আছে যে স্বায়ত্তশাসনের বদৌলতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সঠিক শৃংখলা বিঘ্নিত হচ্ছে। আরও এমন অনেক অভিযোগ দাঁড় করানো হচ্ছে অধ্যাদেশ শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে। কথা হচ্ছে, সরাসরি মনোনীত উপাচার্য কি এ রোগ প্রতিকারের ওষুধ? বর্তমানে এত কিছুর পরও একটা check and balance আছে, আছে সমালোচনা যেমনটি আছে দেশের বর্তমান নির্বাচিত সংসদের সময়ে। একটা নির্বাচিত সরকার ভুল-ভ্রান্তি করলে অথবা অদৃশ্য বলে তার বিপরীতে কি স্বৈরতন্ত্র কাম্য হতে পারে? অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এমন কি বর্তমানে মনোনীত উপাচার্যরাও) নিজেদের ইচ্ছেমত, নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে এবং প্রভুকে খুশি করার জন্য অনেক মেধাবী ছাত্র বাদ দিয়ে পছন্দ সই শিক্ষক নিয়োগ করেছেন বা করছেন। যেখানে রোগী বলছে যে, এ ওষুধ বছরের পর বছর খেয়েও রোগ সারছে না সেখানে ডাক্তার সাহেব কি এই ওষুধের পুনরাবৃত্তি করবেন, না নতুন ওষুধের সন্ধানে যাবেন।

৪. আসল রোগ, আসল ডাক্তার এবং আসল ওষুধ ঃ

তাহলে দেখা যাচ্ছে; রাজনীতি-তা শিক্ষক, ছাত্র কিংবা রাজনীতিবিদের-

কোন রোগ নয় বরং এটা সকল রোগের মহৌষুধ। আর শিক্ষক রাজনীতিবাদ কোন বিকৃতি লাভ আদৌ করে থাকে তবে তা দেশীয় রাজনীতির বিকৃতির জন্যই কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক। অনেকে বলে থাকেন বিদেশে শিক্ষক ও ছাত্ররা শুধুমাত্র পড়াশুনা ও গবেষণা করে থাকেন রাজনীতি করেন না মোটেও। ব্যাপারটা বোধ হয় ঠিক তানয়। হার্ভার্ড, এমআইটি বা কেম্ব্রিজ এমনকি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাও প্রাণভরে রাজনীতি করেন। তবে তার আওয়াজটা আমাদের দেশের চাইতে কম করেন (ক) ওইসব দেশের বিরাজমান গণতান্ত্রিক, এবং রাজনৈতিক স্বচ্ছতা ও পরিপক্কতা আমাদের দেশের চাইতে অনেক বেশি (খ) রাজনৈতিক লো শিক্ষক বা ছাত্রদেরকে পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেন না; (গ) প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রিকরণ ব্যবস্থা বিরাজমান এবং জবাবদিহিতা আছে; (ঘ) শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বরাদ্দ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি এবং (ঙ) শিক্ষিতের হার ও আর্থসামাজিক নির্দেশিকাগুলো আমাদের চাইতে অনেক বেশি। কাজেই তুলনাটা যেমন তুলনামুলক নয়, তেমনি উক্ত কারণে আমাদের শিক্ষক ও ছাত্ররা রাজনীতি করবে তাও কিন্তু অমূলক নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল রোগ তা হলে দাঁড়ালো রাজনীতি নয় বরং (ক) সন্ত্রাস (খ) আর্থিক শৃংখলা ও (গ) নিয়ম ও প্রয়োজনীয় গুণবহির্ভূত প্রমোশন। প্রথমটির সমাধান কেবলমাত্র রাজনীতিবিদরাই দিতে পারেন। এটা Exogeneous Variable যার মাত্রা মডেল কর্তৃক নির্দেশিত নয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ভেতরের ব্যাপার অর্থাৎ endogeneous। শুধুমাত্র (খ) ও (গ)-এর জন্য অধ্যাদেশ পরিবর্তন নামক ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া মানে দাঁড়ায় মশার সাথে রাগ করে মশারী পোড়ানো। একটা নির্বাচিত সরকারের কাছে কাম্য হচ্ছে শিক্ষক সম্পাদক ডেকে নিয়ে সলাপরামর্শের মাধ্যমে ওই ধরনের বিচ্যুতিগুলোকে ঠিক করে রাখা। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের বুঝতে হবে যে সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের মতই তাঁদেরও কাজকর্মের জবাবদিহিতা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিয়মিত ক্লাস ও যথাসময়ে পরীক্ষা নেয়ার (সন্ত্রাসের কারণে যন্ত্রণা হলে) ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হবে। নিজেদের কারণে এসবের কোন প্রত্যয় ঘটলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া মোটেও অযৌক্তিক নয় যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনিতে নেয়া হচ্ছে।

অবশেষে শিক্ষকদের নানাপ্রকার আলোচনা ছাড়া নিয়ন্ত্রণ নামক ওষুধ চাপিয়ে "মুখরা রমণী বশীকরণ" নীতি গ্রহণ করলে রমণীকে আরো মুখরা করে তুলতে পারে। ঐ ক্ষেত্রে ডাক্তাররা হয়ত বা পা বাঁচাতে অন্য কোন 'পরিষদে' তাৎক্ষণিকভাবে যোগ দেবেন কিন্তু নির্বাচিত সরকারকে এর দায়-দায়িত্ব নিতে হতে পারে।

আবদুল বায়েস ঃ কলাম লেখক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক।